



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 454 - 459

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

‘কি মায়ায় বেঁধেছ আমায়!’ : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘মায়ামৃদঙ্গ’ উপন্যাসে সমকামিতা প্রসঙ্গে দু’চার কথা

গিরিধারী মণ্ডল

Email ID: giridharimondal73@gmail.com

 0009-0001-4100-3828

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Homosexuality,
Sexual politics,
Sex and
Gender,
Romantic
relationship,
Bengali novel,
Syed Mustafa
Siraj,
Mayamridanga.

Abstract

The reflection of sexuality in literature is not a new phenomenon. Sexuality has been reflected in Bengali literature since ancient times. Sexuality has various dimensions. However, while heterosexuality has received considerable attention, homosexuality has not received as much. Homosexuality is being widely reflected in contemporary literature. Responsible writers have taken up their pens to dispel the misconceptions about homosexuality that are deeply ingrained in people's minds. They have spoken out in defense of people's human rights. The right to sexuality is undoubtedly a human right. Narrow-minded sexual politics attempts to undermine this human right. On the other hand, compassionate writers are determined to grant human dignity to people. For them, homosexuality is not merely a physically driven, perverted sexual act. They firmly believe that romantic love relationships exist among homosexuals as well. Syed Mustafa Siraj is one such writer. In his famous novel 'Mayamridanga', he has unveiled a unique world of homosexual relationships to the readers. He has established that homosexuality is not merely lust; it is love. Here, I have primarily tried to briefly present the topic of homosexuality. I have tried to say that homosexuality is a natural sexual orientation, not an unnatural sexual practice that goes against nature. I have tried to analyze how the novel 'Mayamridanga' gives expression to the relationship between one man and another. This novel is an exceptional novel by Siraj. This has enriched the world of Bengali novels centered on homosexuality. In this novel, Siraj has poured out the wealth of his personal experiences. Many claim this to be Siraj's autobiographical novel.

Discussion

সাধারণত Homosexuality-র বাংলা তর্জমা করা হয় সমকামিতা। ‘হোমোসেক্সুয়ালিটি’ শব্দটি গ্রিক শব্দ ‘হোমো’ এবং ল্যাটিন শব্দ ‘সেক্সাস’-এর সমন্বয়ে গঠিত। গ্রিক ভাষাতে ‘হোমো’ কথার অর্থ ‘সমধর্মী’ আর ‘সেক্সাস’ কথার অর্থ যৌনতা। সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করার যৌন প্রবৃত্তিকে সমকামিতা আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। তবে সমকামিতার পরিসর কেবলমাত্র যৌনকর্মের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এর সঙ্গে যুক্ত থাকে একটা নান্দনিক আকর্ষণবোধও। কিন্তু সামাজিক

বিচারকমণ্ডলী, যাঁরা এটাকে নিছক বিকৃত যৌনাচার ছাড়া আর কিছুই ভাবতে চান না, তাঁদের অন্ধত্বের প্রতি একরাশ ঘৃণা নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে হয় –

“হায় দুশো বছরের প্রাচীন অন্ধত্ব, তোমাদের কে বোঝাবে, যে, যৌনচেতনা কেবল যোনি-লিঙ্গ-পায়ুছিদ্রে আটকে থাকে না, থাকে মগজে, থাকে হৃদয়েও।”^১

আধুনিক কালে আমরা ‘সমকাম’ শব্দের পরিবর্তে ‘সমপ্রেম’ শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করছি। কামের সীমা অতিক্রম করে প্রেমের অসীমে এই অভিযাত্রার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি মানবিক মূল্যবোধপুষ্ঠি সন্দেহ নেই।

সমকামিতার বহুপ্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। বিভিন্ন কারণে মানুষ সমকামী হতে পারে। তবে সমকামিতার সম্পর্কে আমরা প্রায়শই যে ভুল করে থাকি সেটা হল এই যে, এর ক্ষেত্র কেবল শারীরিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ। তবে গবেষণা জানাচ্ছে সমকামিতা শুধুমাত্র শারীরিক বিষয় নয়, এটা অনেক পরিমাণে মনস্তাত্ত্বিক। লিঙ্গভেদে সমকামীরা দুই প্রকারের হতে পারে – পুরুষ সমকামী ও নারী সমকামী। কোনো পুরুষ যদি অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাকে বলা হয় পুরুষ সমকামী (Gay); অন্যদিকে একজন নারী যদি অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে সে নারী সমকামী (Lesbian)। যাইহোক সমকামীদের পারস্পরিক সম্পর্ক নারী-পুরুষের সম্পর্কের মতই স্বাভাবিক। এই ‘গে’ এবং ‘লেসবিয়ান’ সম্পর্কে আবার একজন হয় অনেকটা পুরুষালি স্বভাবের, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Butch, আর অন্যজন কিছুটা মেয়েলি প্রকৃতির, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Fem, অর্থাৎ এদিক দিয়ে দেখলে এই সম্পর্কে অন্য নারী-পুরুষের সম্পর্কের মতো স্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়।

যেদেশে লিঙ্গ পূজিত হয়, সেই দেশে যৌনতা সম্পর্কে নাক না কোঁচকানোটাই অভিপ্রেত। তবুও কেন যে ভারতীয় সমাজে যৌনতাকে অত্যন্ত উৎকটভাবে অবদমিত করে রাখার প্রয়াস দেখা যায় সে প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া খুব দুর্লভ; বার্নার্ড শ যতই বলুন না কেন কেবল টেলিফোন ডিরেক্টরি ছাড়া যৌনতা সব জায়গাতেই কম বেশি পাওয়া যায়। আবার যৌনতা যদি হয় সমলিঙ্গের মানুষের প্রতি – তাহলে তো কথাই নেই। সমাজের জ্যাঠামশাইরা রে রে করে ছুটে আসেন। তাদের দৃষ্টিতে সমকামিতা অত্যন্ত গর্হিত, প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যে বা যারা এর চর্চা করে তারা নরকের কৃমিকীট ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সত্যি কী সমকামিতা ঘৃণ্য, প্রকৃতিবিরুদ্ধ? উত্তরে বলা যায়, রক্ষণশীল সমাজ সমকামিতাকে প্রাকৃতিক বলে স্বীকার করতে না চাইলেও এটি রহস্যময় প্রকৃতির একটি স্বাভাবিক বিষয়।

সমকামিতা যদি প্রাকৃতিক বিষয় না হতো, তাহলে প্রকৃতিরাজ্যের বিপুল সংখ্যক প্রজাতির মধ্যে সমকামিতার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যেত না। জীববিজ্ঞানী পিটার বকম্যান আমাদের জানিয়েছেন কয়েকটি ব্যতিক্রমি প্রজাতি ছাড়া প্রকৃতিতে সমকামিতা দেখা যায় না এমন প্রজাতির দৃষ্টান্ত বিরল। Bruce Bagemihl তাঁর ‘Biological Exuberance : Animal Homosexuality and Natural Diversity’ গ্রন্থে এমন ৫০০টি প্রজাতির উল্লেখ করেছেন যাদের মধ্যে সমকামিতা দেখা যায়। এর পাশাপাশি আমরা জোয়ান রাফগার্ডেনের ‘আউট ইন ন্যাচার : হোমোসেক্সুয়াল বিহেভিয়ার ইন দ্য এনিমেল কিংডম’ ডকুমেন্টারিটির কথা স্মরণ করতে পারি যেখানে প্রাণীজগতের অসংখ্য সমকামিতার দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে আমরা ম্যানহাটনের সেন্ট্রাল পার্কের চিড়িয়াখানার পেঙ্গুইন দ্বয়ের কথা উল্লেখ করতে পারি। এই পেঙ্গুইন দ্বয়ের উভয়েই পুরুষ অথচ উভয়ের মধ্যে যৌনতা দেখা যায়। এছাড়া হুইপটেল গিরগিটির কথা আমরা জানি। এই গিরগিটিকুলের সব সদস্যই নারী। যৌনকর্মের জন্য এদের পুরুষ সঙ্গীর প্রয়োজন হয় না। আবার কমোডো ড্রাগন প্রজাতির মহিলা ড্রাগনরা কোনো পুরুষ সঙ্গী ছাড়াই বাচ্চার জন্ম দিয়ে লন্ডনের চিড়িয়াখানায় রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কাজেই মানুষের মধ্যেও যে সমকামিতার অস্তিত্ব থাকবে এ আর অস্বাভাবিক কী! মানুষ তো প্রকৃতিরাজ্যের বাইরে নয়।

অতএব সমকামিতাকে অস্বাভাবিক বা প্রকৃতিবিরুদ্ধ হিসেবে দেখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। প্রকৃতির দোহায় দিয়ে সমকামীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা মানবিকতার পরিপন্থী। এর পশ্চাতে আমরা সংকীর্ণ রাজনীতির সন্ধান পাই। এটাও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে মানব সভ্যতার ইতিহাসই হল প্রকৃতি বিরুদ্ধতার ইতিহাস। যেমন প্রকৃতি তো আমাদের পোশাক পরিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেনি। তাহলে কেন আমরা পোশাক পরিধান করছি। আমরা আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য

বিধানের প্রয়োজনে প্রতি পদক্ষেপে প্রাকৃতিক নিয়মের উল্লঙ্ঘন করি না কী? প্রকৃতির নিয়মকে শিরোধার্য করলে আমাদের প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়ে উপনীত হতে হয়। তার জন্য কী আমরা প্রস্তুত আছি? আমাদের সভ্যতার বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা কী তাতে ভুল হয়ে পড়বে না? কাজেই সমকামিতার বিরুদ্ধে প্রকৃতিকে খাড়া করা চলবে না। উপরের উদাহরণগুলি থেকে এটা অন্তত স্পষ্ট যে সমকামিতা কোনো প্রকৃতিবিরুদ্ধ বিষয় নয়। সমকামীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ তাদের মানবাধিকারকে খর্ব করে। অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু লিখেছেন –

“সমলিঙ্গের প্রেম ও ভালোবাসার একটা স্বতন্ত্র ভূবন আছে। তার স্পন্দন অন্য। বিচরণও অন্য। এ যেন এক অন্য ভূবন। এই ভূবনের জীবনধারা, সুখ দুঃখ, পালপার্বন, আমোদপ্রমোদ, সংস্কার বিশ্বাস – কোন কিছুই আমরা খোঁজ রাখি নি। অথচ আমাদের ‘ছিমছাম ও পরিচ্ছন্ন’ ভূবনের পাশাপাশি এই ভূবনের অবস্থান এখানেই এদের জীবন ও অস্তিত্ব সরগরম। তবে সমাজের সিংহ ভাগের মন-মর্জি আর রুচির বিচারেই সমলিঙ্গের প্রেম নিয়ন্ত্রিত। ফলে তার গতি কখনই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠেনি। বরং তারা ‘সুভদ্র সমাজ’-এর কুশিক্ষার কটাক্ষে বিদ্ধ হয়ে রয়েছে আহত হাঁসের মত, এক প্রান্ত ঘেঁষা প্রাণের সারি।”^২

দীর্ঘদিন ধরে সমাজে সমকামীদের যেভাবে দেখা হয়েছে বা সমকামীদের দেখার যে চোখ আমরা পেয়েছি তাতে মনে হয় ‘হোমোফোবিয়া’ সমাজের উপর চেপে বসেছে। গ্রীক শব্দ ‘ফোবিয়া’-র অর্থ কোনো কিছু প্রতি অযৌক্তিক ভীতি। শব্দটি মার্কিন মনোবিজ্ঞানী জর্জ ওয়েইনবার্গের সৃষ্টি। হোমোফোবিয়া যাদের আছে অর্থাৎ হোমোফোবিক ব্যক্তির কোনো কারণ ছাড়াই সমকামীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। এটা এক রকমের মানসিক অসুখ। ইতালির অধ্যাপক ইমানুয়েল এ জানিনি হোমোফোবিয়াকে মানসিক অসুস্থতা হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। সংখ্যালঘু এই সমকামীদের উপর এই সামাজিক হোমোফোবিয়ার প্রভাব মারাত্মক। যত্রতত্রই তারা বিপুল নির্যাতনের শিকার হন; নির্বাসন বা মৃত্যুদণ্ডের মতো দণ্ডও তাদের দণ্ডিত হতে হয়। এমনকি নিজের পরিবার পরিজনদের কাছ থেকেও সমকামীর সহানুভূতি লাভ করেন না। ফলস্বরূপ সমকামীরা তাদের পরিচয় লুকিয়ে রাখতে একপ্রকার বাধ্য হয়। কেননা –

“প্রতিষ্ঠিত সামাজিক মূল্যবোধে এই মানসিকতা অত্যন্ত গর্হিত। তাই অতি সংগোপনে চোরাগোপ্তা পথে এ ভালবাসা এগিয়ে চলে। অন্যদিকে এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করবার চেষ্টাও চলে, নানাভাবে। তাই নানা অস্থিরতা ও জটিলতার টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠতে থাকে সমপ্রেমী মানুষের সমস্যা-দীর্ঘ ব্যক্তিত্বের কাঠামো।”^৩

আত্মপরিচয়ের এই সংকট থেকেই তারা ধীরে ধীরে সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এক প্রকার অবসাদ ক্রমশ গ্রাস করতে থাকে তাকে। এভাবেই তাদের জীবনে ঘনিজে আসে এক ভয়ংকর ট্রাজেডি। অনেক সময় সমকামিরা সামাজিক নির্যাতনের অতিরেকে আত্মহত্যার পথও বেছে নেন। সমকামীদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটানোটা আশু আবশ্যিক।

সমকামিতার বিষয়টিকে ঠিকঠাক অনুভব করতে না পারার অক্ষমতা জনিত কারণে এর সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণা সমাজে প্রচলিত আছে। অনেকে এটাকে পছন্দ (Choice) মনে করে ভুল করেন। আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে সমকামিতা শাস্তিযোগ্য অপরাধের তালিকাভুক্ত ছিলো। ব্রিটিশ জমানার ৩৭৭ ধারা সমকামী যৌনতাকে ‘অপ্রাকৃতিক যৌনতা’ হিসেবে গণ্য করে। আশার কথা ১৫৮ বছর পর ভারতীয় দণ্ডবিধির এই মধ্যযুগীয় আইনটি আজ বিলুপ্ত হয়েছে। রক্ষণশীলতার চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করে শেষপর্যন্ত জয়লাভ করেছে যৌন আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে ব্যক্তির অধিকার। ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টত সমকামিতাকে বৈধতা দান করেছে। তবে নিছক আইন করে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো সম্ভব নয়। মানুষকে তার শুভবোধ দিয়ে বিষয়টিকে বিচার করতে হবে। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে সমকামীরাও মানুষ। আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো তাদেরও মানবিক অধিকারগুলিকে সুনিশ্চিত করতে হবে। সনাতন দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিহার করে মূল ধারার ‘হেটেরোসেক্সুয়াল’ যৌনতার পাশাপাশি অন্যধরনের যৌনতার অবস্থানকে সহজভাবে স্বীকার করতে হবে।

আসলে মানুষের যৌন-প্রবৃত্তি একরৈখিক নয়। এখানে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ যেমন সত্য, একইভাবে সত্য সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণও। বিসমকামিতার সমান্তরালে চলতে থাকে সমকামিতা। তাই অনেকে একে সমান্তরাল

যৌনতা নামে অভিহিত করে থাকেন। এই সমকামিতা একদিকে হতে পারে জন্মগত, অন্যদিকে আবার আচরণগত। জন্মগত সমকামী যৌনপ্রবৃত্তিকে কোনোভাবেই পরিবর্তিত করা যায় না। অনেক সময় এই পরিবর্তনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা করা গেছে কিন্তু আদতে তাতে লাভ কিছু হয়নি। তাই এই প্রবৃত্তিকে স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে নেওয়াই শ্রেয়।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের আত্মজীবনিক উপন্যাস ‘মায়ামৃদঙ্গ’। মূলত আলকাপ দলের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নাকে উপজীব্য করে রচিত হলেও এই উপন্যাসে সমকামী যৌনতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। আমরা জানি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ নিজে ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আলকাপ দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উপন্যাসটি রচনা করেছেন তিনি। আলকাপ দলের ‘ছোকরা’-কে কেন্দ্র করে উপন্যাসটির শরীরে সমকামী যৌনতার চোরাস্রোত বয়ে গেছে আগাগোড়া –

“পুরুষ কখনও নারী হয় না। তার অর্থ হল, ‘নারীলোক’-এর যা সব সুন্দর সুন্দর জিনিস – ভালোবাসা বলো, মায়ামমতা বলো, স্নেহ বলো, কি দয়াদর্শি বলো, পুরুষলোকের মধ্যে আশা করেছে কি মরেছে। কিন্তু আলকাপের শিল্পী যে তা মানে না। সে পুরুষের মধ্যেই খুঁজে পেতে চায় তার কাম্য নারীকে। ঘরের নারী তার মন টানতে পারে না। তার মনের সবটুকু জুড়ে থাকে সেই ছোকরা। যাকে সে হয়তো পায়, হয়তো বা পায় না। এ এক অদ্ভুত মায়াময় জগৎ। আলকাপের ছোকরা বড় কঠিন মায়ায় বেঁধে রাখে পদ্মার এপার-ওপার। মেয়েদের মতো দীঘল কেশ, দু’হাতে চাঁদির চুড়ি, শাট আর পাজামা পরনে, পায়ে কাবুলি চপ্পল, ফরসা মুখের চাপা চিবুক, মসৃণ নিটোল গাল, টানা টানা চোখ, সে পুরুষ তবু পুরুষ নয়, নারী – অথচ নারীও না, সে কিম্পুরুষও নয় – সে এক অমর্ত্য মায়াময়।”^৪

বাংলার একটি প্রাচীন লোকনাট্য হল আলকাপ। এই আলকাপ দলে যে ছেলেরা মেয়ে সেজে অভিনয় করে তাদের ‘ছোকরা’ বলা হয়। এরকমই এক আলকাপ দলের ছোকরা সুধীরের প্রেমে পড়েছিলেন সিরাজ। সিরাজ ও সুধীরের সম্পর্কের রসে জড়িত হয়ে উপন্যাসে এসেছে ঝাঁকসা ওস্তাদ আর শান্তি নামের ছোকরা। আলকাপ দলের মাস্টার সিরাজের যুগপৎ আনন্দ বেদনার অসামান্য দলিল ‘মায়ামৃদঙ্গ’ উপন্যাসটি –

“প্রথম যৌবনের ছ’সাতটা বছর, এখনকার বিবেচনায় খুব দামী আর সম্ভাবনাপূর্ণ ছ’সাতটা বছর – তার মানে খুব কম করে ধরলেও আড়াই হাজার দিন আর আড়াই হাজার রাত, আমার যা নিয়ে এবং যাদের সঙ্গে সৌন্দর্য ও যন্ত্রণায় কেটে গেছে, তাই এবং তাদের নিয়েই এই উপন্যাস।”^৫

‘মায়ামৃদঙ্গ’ উপন্যাসের নিবিড় ও অন্তরঙ্গ পাঠে আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি যে সমকামিতা কেবলমাত্র যৌনকর্ম নয়। ঝাঁকসু ওস্তাদ ও শান্তি এবং সনাতন মাস্টার ও সুবর্ণর সম্পর্কের রসায়ন আমাদের এক অন্য ভুবনের আশ্বাদ করায়, যে ভুবন এক ‘বিরল মায়াময়’-য় আচ্ছন্ন। ঝাঁকসু ওস্তাদ বহুপত্নীক, কিন্তু স্ত্রীদের প্রতি তার আকর্ষণ নেই। তার আকর্ষণের কেন্দ্রে অবস্থান করে ‘ছোকরা’ – কখনো সুফলের বেশে বা কখনো শান্তির বেশে। তাই দেখি সুফল পালিয়ে গেলে ঝাঁকসু প্রাণপাত পরিশ্রম করে শান্তিকে তৈরি করতে। যদিও সুফল তার চেতনার ভূমি অধিকার করে বিরাজিত থাকে–

“শালা ঢামনা আমার বুক খালি করে দিলে। বুকখানা গ্রীষ্মকালের আকাশের মতো জ্বলে। বিবাহ করলাম। বুক ভরবার বড় আশা নিয়ে বিবাহ করলাম। কিন্তু ফজল, কী হল? সে জ্বালা তো শেষ হল না। সুফল যা দিয়েছে তা তো কেউ দিতে পারল না। জ্বালা নিয়ে ছটফট করে মা জাহ্নবীর ধারে গিয়ে বসে থাকি। একদিন হঠাৎ যেন মা আমার বড় দয়া করে সামনে তুলেছিলেন ওই শান্তিকে। আঃ ফজল রে, সে কি দিন, সে কি আনন্দ। ফের আকাশের চাঁদ পেলাম হাতের মুঠোয়।”^৬

এই অনুভব কী কেবল যৌনতা থেকে? ঝাঁকসু ওস্তাদ চায় পুরুষ ছোকরাকে দেহে-মনে নারীতে রূপান্তরিত করতে। তাই তার চেষ্টার অন্ত্য নেই। কোনো পরিশ্রমের কাজ যাতে শান্তির দেহের কোমলতা নষ্ট করতে না পারে সেদিকে ওস্তাদের সতর্ক দৃষ্টি।

“এ নামতা ভুলো না – চলনে বলনে শয়নে স্বপনে তুমি নারী – সর্বদা নারী তুমি ভাবনায় ইচ্ছায় আহারে
বিহারে। তবে না আলকাপের সার্থক ছোকরার জন্ম!”^১

ওস্তাদের কথায় আলকাপের ছোকরা এক ‘মায়া’। সেই মায়ায় বঁদু হয়ে থাকে ঝাঁকসু, অন্য কোনোদিকে তাকাবার অবকাশ তার নেই। লিঙ্গ পরিচয়ে পুরুষ এই ছোকরাকে নিয়ে ঝাঁকসুর এহেন আচরণকে আদিখ্যেতা বলে মনে হয় তার স্ত্রী গঙ্গামণির। এর পশ্চাতে অবশ্য তার অতৃপ্ত যৌন আকাঙ্ক্ষার বিষয়টিও ক্রিয়াশীল। সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না কী আছে এই পুরুষ শান্তির মধ্যে যার জন্য ওস্তাদ পাগল; ঝাঁকসু শান্তিকে চুষন করে অথচ গঙ্গামণির প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করে না। একদিন তাই গঙ্গা সেই মায়াঝাঁপির ঢাকনা খুলে তার ভিতরটা ছুঁয়ে দেখল, ‘গায়ে গায়ে জড়াজড়ি যেন দুটি নাগনাগিনী জোড় বেঁধে শুয়ে আছে’। গঙ্গামণির সঙ্গে শান্তিকে মৈথুন করতে দেখে বেদনাক্লান্ত হয়েছিল ঝাঁকসু। তবে সে বেদনা স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার দিক থেকে যত না এসেছে, তার থেকে অনেক বেশি এসেছে শান্তিকে পুরুষালি আচরণ করতে দেখে। ওস্তাদ শান্তিকে নারী করে গড়তে চেয়েছিল। কিন্তু গঙ্গা শান্তির পুরুষত্বকে জাগিয়ে দিয়েছে। এজন্য গঙ্গার প্রতি ঝাঁকসুর দৃষ্টিপট নেই, ঝাঁকসুর ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর শান্তিকে অনুসরণ করতে থাকে। আমরা দেখি ঝাঁকসুর অবহেলা সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত গঙ্গামণি আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু তাতেও ঝাঁকসু বিচলিত হয়নি।

পদ্মাতীরে কালীতলা বাজারের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ননীবাবু শান্তিকে বলেছিল সাক্ষাৎ কিম্বদন্তি হে তুমি। ‘এ জন্মে আর তোমার মানুষ হবার আশা নেই – এ আমি শুনে বলে দিলাম’। লক্ষ করার বিষয় এখানে ‘মানুষ’ শব্দটি পুরুষ শব্দকে দ্যোতিত করেছে। এই কথা থেকে শান্তির মতো মানুষদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় লাভ করা যায় খুব সহজেই। লিঙ্গ পরিচয়ে যে পুরুষ সে যদি মেয়েদের মতো আচরণ করে সমাজ সেটাকে ভালো চোখে দেখে না। ননীবাবুর কথায় তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

ঝাঁকসুর কাহিনির সমান্তরালে এসেছে সনাতন মাস্টারের কাহিনি। সনাতন মাস্টারও তার দলের ছোকরা সুবর্ণর প্রতি দুর্বল। নারীবোশী পুরুষের প্রতি এই আকর্ষণ তার নিজের কাছেই এক ‘বিরল মায়া’ বলে প্রতিভাত হয়েছে। এই মায়াতে পড়েই তো সনাতন সুধাকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। শ্বশুরবাড়িতে অসুখী সুধা সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সনাতন মাস্টারকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু তার নারীসুলভ কোমল বাহুল্যতার বন্ধন সনাতন মাস্টারকে বাঁধতে পারেনি। সনাতন মাস্টার সুবর্ণর কাছেই নিজেকে ধরা দিতে চেয়েছে। ঘটনা পরম্পরায় সুধা যখন সনাতন মাস্টারের জন্য প্রতীক্ষারত তখন আলকাপ দলেরই দু’জন তাকে ধর্ষণ করে। মৃত্যু হয় সুধার। সুধার মৃত্যু সনাতন মাস্টারের বিস্ময় উৎপাদন করেছিল ঠিকই, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। এরপর সনাতন মাস্টার সুবর্ণকে নিয়ে ঝাঁকসুর আশ্রয়ে চলে যায়। সুবর্ণকে ছুঁয়ে থেকে একটা নতুন পালা বাঁধবার সাধ হয় তার।

পাশাপাশি দুটি কাহিনিকে রেখে তাঁর ‘মায়ামৃদঙ্গ’ উপন্যাসের কথাবয়ন করেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। দুটি কাহিনিতেই আছে ছোকরার মায়া। যে মায়ায় পড়েছিলেন ঔপন্যাসিক নিজেও। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন –

“আলকাপ দলে ছেলেরাই মেয়ের অভিনয় করত। ‘ছোকরা’ বলা হত তাদের। হাবভাব সব মেয়েদের মতো। ওস্তাদ ঝাঁকসা, আলকাপের রাজা মানা হত তাঁকে। তিনিই আমায় বলেছিলেন একবার গঙ্গার পাড়ে বসে, ‘আপনি একজন লেখাপড়া জানা শিক্ষিত লোক, আপনি এদের মধ্যে থাকলে পড়ে যাবেন’। অধঃপতনে যাওয়ার কথা বলেছিলেন আর কী! তারপর তিনি বুঝিয়েছিলেন, ‘মায়া’ বলে একটা কথা আছে, বলি তার কথা শুনুন। ...আসলে এই যে ইলিউশন, পুরুষ তবু পুরুষ নয়, নারী তবু নারী নয়, হিজরেও না। কিছু নয় অথচ সে আসরে যখন উঠছে, মেয়ে। তাকে দীর্ঘদিন ধরে মেয়ে হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। আসরে তার পূর্ণ নারী হয়ে ওঠার পরীক্ষা। অভিনয়ের মধ্যে একটি মেয়েই প্রতিমার মতো মূর্ত হচ্ছে। এক বিরল মায়া। ওই মায়ারই প্রেমে পড়েছিলাম আমি।”^২

ওস্তাদ ঝাঁকসা আর সনাতন মাস্টারও পড়েছিল এই মায়ায়; যে মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে ঝাঁকসা পারেনি স্ত্রী নিয়ে সুখে সংসার করতে আর সনাতন মাস্টারও পারেনি সুধার মতো মেয়েকে আশ্রয় দিতে। এ সম্পর্ককে কেবল এক সমকামিতা বা সমপ্রেম হিসেবেই গ্রহণ করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আমরা সিরাজের জীবনবীক্ষার দিকে একটু আলোকপাত করি। ‘মায়ামৃদঙ্গ’ নিঃসন্দেহে আলকাপ জীবনের আনন্দ-যন্ত্রণার প্রতিবিম্ব বিশেষ। স্বল্প পরিসরে অঙ্কিত ঝাঁকসার গুরু মনিরুদ্দিনের মধ্য দিয়ে লেখক আলকাপেদের জীবন-যন্ত্রণার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। শেষ জীবনে মনিরুদ্দিন আলকাপ ছেড়ে মৌলানার শরণাপন্ন হয়েছেন। মসজিদের বাইরে বের হন না, অনবরত খোদাতলার কাছে কান্নাকাটি করেন। আমরা জানি ইসলাম সমকামিতাকে পাপ হিসেবে পরিগণিত করে। ঝাঁকসা মনিরুদ্দিনের কাছে আশীর্বাদ চায়তে গেলে মনিরুদ্দিন তাকে শুনিয়েছেন, আল্লার হুকুমে ‘সাদ’ আর ‘গোমরাহ’ নামের দুটি শহর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আখ্যান। এই শহর দুটিতে পুরুষ পুরুষকে ভালোবাসতো আওরতের মতো; সেখানে পুরুষ পুরুষের পিয়ারা, দিলের রওশন – হৃদয়ের বাতি। মনিরুদ্দিনের মতে এ গুনাহর মাফ নেই। এই পাপে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হতে হয়, যার তেজ এই দুনিয়ার আগুনের থেকে আশি হাজার গুণ।

মনি ওস্তাদ পাপ-ভয়ে ভীত। তাঁর স্বীকারোক্তিতেই সে কথা ধরা পড়েছে। তিনি বলেছেন – পুরুষকে নারী সাজিয়ে লক্ষ মানুষের মনে নেশা ধরিয়েছি – সেই নেশার ঘোরে নিজেও মজেছি –এ মহাপাপ। অনন্ত জাহান্নাম সামনে জ্বলে। গায়ে আঁচ লাগে ...। লেগেছিল। ও যে কী জ্বালা তা আলকাপেরা টের পায়। খুব কাছেই যে বিশাল আগুন। তাপে ফোসকা পড়ে। অ-ধরাকে (মোহিনী মায়ী) যত ধরতে চায়, দেখে রক্ত-মাংসের ক্লেদ আর গ্লানি। লোভের পাপী হাত আঁচড় কাটতেই প্রতিমার গায়ে বেরিয়ে পড়ে খড় আর বাঁশ। ইষ্টদেবতাকে হাতের মুঠোয় পেতে গেলে তাপ লাগে। মোহভঙ্গ হবার পর থাকে শুধু অশ্লীলতা। তার নাম ‘সমকামিতা’।

লক্ষ করার বিষয় ওস্তাদ ঝাঁকসা কিন্তু মনিরুদ্দিনের অভিপ্রায় অনুসারে আলকাপকে বিদায় জানাতে পারেনি। সে নতুন পালার কথা ভেবেছে। কারণ এ যে মায়ী – এ যে প্রবল প্রেম। এতো নিছক শারীরিক যৌনাচার নয়। তাই প্রবল প্রেম যেমন সবকিছুকে ভুলিয়ে দেয়। আলকাপের প্রেম তথা ছোকরার প্রেম ওস্তাদ ঝাঁকসাকে মোহিনী মায়ী ভুলিয়ে ঘর থেকে পথে বের করেছে।

Reference:

১. পাল, অবন্তিকা, ‘লিঙ্গ যৌনতা যৌনহিংসা’, অনুষ্টুপ, কলকাতা, মার্চ ২০১৯, পৃ. ৩৮
২. মজুমদার, অজয়, ও নিলয় বসু, ‘সমপ্রেম’, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৩, ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য
৩. তদেব, ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য।
৪. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, ‘মায়ামৃদঙ্গ’, দে’জ পাবলিশিং, কোলকাতা, মার্চ ২০১৬, কভার পেজ অংশ দ্রষ্টব্য।
৫. তদেব, ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য।
৬. তদেব, পৃ. ২২
৭. তদেব, পৃ. ১৬
৮. ‘কে যেন আমায় দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে’ : বইয়ের দেশ, সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের নেওয়া সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সাক্ষাৎকার, সংখ্যা- অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১, এ বি পি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।